জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ভীষ্মদেবের ছেলেবেলা

সাধারণ গড়িয়ে যাওয়া উত্থানপতনহীন জীবন কেটে চলেছে আশুতোষ-প্রভাবতীর। সেই স্রোতহীন জীবনে হঠাৎ একদিন সবাই সচকিত হয়ে উঠল যেদিন দেখা গেল পাঁচ বছরের ছোট ভীষ্মদেব, ডাকনাম যার 'কালো', সে ছাদের পাঁচিলে পা ঝুলিয়ে বসে ক'দিন আগে দেখে আসা 'সীতাহরণ' পালার গান অবলীলায় গেয়ে চলেছে। সবাই অবাক এই ভেবে যে, যে বংশে পূর্ব কয়েক পুরুষের মধ্যে কেউ সংগীতচর্চা করেছেন এমন জানা যায় না, সে বংশে এমন নিখুঁত সুরে গান করা সন্তান এলো কেমন করে?

ক'দিনের মধ্যেই আবার চমক। প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন জানিয়ে গেল "কালো কি সুন্দর বাঁশী বাজায়।" এবার সবার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। পিতা আশুতোষের মধ্যে দেখা দিল যুগপোযোগী চিন্তা এবং বিরক্তি। তিনি বললেন, "ছেলে কি বড় হয়ে যাত্রা দলে যাবে?" মা প্রভাবতী কিন্তু অনেক বেশী দূরদর্শিনী ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রের মধ্যে একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। পুত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করালেন, কিন্তু একটা চিন্তা মাথায় রাখলেন যে তাকে কি ভাবে গান শেখানো যায়, সংগীতে পারদর্শী করা যায়।

দ্বিজেন শেঠ মহাশয় এলেন। তিনি ভীষ্মদেবকে হারমোনিয়াম কিভাবে বাজাতে হয় তা দেখালেন। একবার দেখানোই যথেষ্ট হয়ে গেল। তারপর ঐ পাঁচ-ছয় বছরের বালকের হারমোনিয়াম বাজানোর দক্ষতা দ্বিজেনবাবুকে তাঁর সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করে দিল। বালকের হারমোনিয়াম বাজানোর দক্ষতা তাঁর অভিভাবকদের জানালো যে ঐ যন্ত্রের জন্য তার আর শিক্ষক নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গান? গান কার কাছে শেখানো যায়? আশুতোষের এক ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সে সময় হাসির গান গেয়ে নাম করেছিলেন। তাঁর ওপর ভার পড়ল বালকের তালিমের। কিন্তু ভারতীয় সংগীতবিদ্যায় নিজের কোন তালিম না থাকায় হরিদাসবাবু অচিরেই বুঝলেন যে এই প্রতিভাকে সামাল দেওয়া তাঁর মত লোকের কর্ম নয়। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কয়েকটি গান শেখানোর পরই প্রভাবতী দেবী তাঁর কাছে পুত্রের শিক্ষা বন্ধ করলেন। তাঁর আবার ভাবনা শুরু হল এবার সংগীত শিক্ষার জন্য কি করা যায়। বাড়ীতে কারোরই সংগীত বিদ্যায় কোনও জ্ঞান না থাকায় পথ খুঁজতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। ঠিক এই সময়, যে কখনই বলতে গেলে কিছু চায় না সেই বালক ভীষ্ম, মা'র কাছে আবদার করল, সে পিয়ানো শিখতে চায়। প্রভাবতী দেবী দেবর শিবকৃষ্ণের সাহায্য চাইলেন। শিবকৃষ্ণ তখন ফারপো কোম্পানীতে কাজ করতেন। তিনি জানতেন যে তাঁর সহকর্মী মিঃ সি. জে. গ্রিফিথ ভাল পিয়ানো বাজাতে পারেন। শিবকৃষ্ণ একটা অনুষ্ঠানে তাঁর পিয়ানো বাজানো শুনেও এসেছেন। তিনি স্থির করলেন যে মি. গ্রিফিথকেই অনুরোধ জানাবেন ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে তালিম দেবার জন্য। সহকর্মীর অনুরোধ মি. গ্রিফিথকে রাখতেই হল। এছাড়া তিনি ঐ বালকটির অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথা পূর্বেই শুনেছিলেন। তাই তাকে দেখবার একটা আগ্রহও ছিল। অফিস থেকে শিবকৃষ্ণের সঙ্গে

তিনি এলেন ভীষ্মদেবকে পিয়ানো শেখাবার জন্য। শিক্ষক উপস্থিত, ছাত্রও উপস্থিত, কিন্তু যে যন্ত্রের তালিম হবে সেই পিয়ানো কই? পিয়ানোর কথা তো খেয়াল হয়নি! মি. গ্রিফিথ সমস্যার সমাধান করলেন। বললেন, বাড়ীতে যদি হারমোনিয়াম থাকে তো তাতেই কাজ চলে যাবে। অভিভাবকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁরা ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করে এনে পিয়ানোর ব্যবস্থা না রাখার জন্য বিব্রত বোধ করছিলেন। বালক ভীষ্মের জন্য কেনা ছোট হারমোনিয়ামটি এল। মি. গ্রিফিথ সেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে ভীষ্মদেবকে দেখালেন যে পিয়ানো কেমন করে বাজাতে হয়। বালক মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটি দেখল, তারপর হারমোনিয়ামটি নিয়ে তার রীডের ওপর এমনভাবে দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গুলি চালনা করল যে মি. গ্রিফিথ তা দেখে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"চ্যাটার্জী, ও কি আগে কোথাও পিয়ানো বাজানো শিখেছে?" যখন শিবকৃষ্ণ জানালেন যে এটাই তাঁর পিয়ানোর প্রথম শিক্ষা। তখন মি. গ্রিফিথ বললেন, "আমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রশংসা না করে পারছি না। তুমি আমাকে এনেছ ওকে শিক্ষা দিতে, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে ও-ই আমাকে শিক্ষা দেবে।" মি. গ্রিফিথ ফিরে গেলেন, তবে যাবার পূর্বে তাঁর অভিব্যক্তি দিয়ে বালক ভীষ্মদেবের অসাধারণ প্রতিভার একটা ধারণা অভিভাবকদের মনে দিয়ে গেলেন।

ছেলেবেলায় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

এই সময়ের মধ্যে বালক ভীষ্মদেব কিছুদিন দ্বিজেন চক্রবর্তীর কাছে এস্রাজের তালিম নিল। অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁর সুরেলা হাতের এস্রাজবাদন সকলকে মুগ্ধ করল। কিন্তু সংগীত শিক্ষার জন্য প্রকৃত গুরুর তখনও সন্ধান না পাওয়ায় অভিভাবকেরা চিন্তিত হলেন। কোথায় বা কার ওপর ভার দিলে তিনি পুত্রকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারবেন এই একটা ভাবনা প্রভাবতীদেবীকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। কারণ তিনি তাঁর পুত্রকে রোজই দেখছেন আর বুঝছেন

যে এ হল খাঁটি সোনা। আর তার প্রকৃতিও একটু ব্যতিক্রমী। বিদ্যালয়ে যায়, নিজের মনে গান গায়, হারমোনিয়াম বাজায় আর খেলাধূলা করে। খেলায় সব থেকে বেশী পছন্দ গুলিখেলা, লাট্টু খেলা আর ঘুড়ি ওড়ানো। যেখানেই খেলতে যায় থলে ভর্তি করে গুলি আর লাট্টু জিতে আনে। হেরে যাওয়া ওর কোষ্ঠী বহির্ভূত। কিন্তু অত্যন্ত অভিমানী, অত্যন্ত সংবেদনশীল মন ওর। আর কিসের একটা ভাবনায় যেন ও বিভোর হয়ে থাকে। একদিন তাকে বাজারের থলি আর টাকা হাতে দিয়ে বলা হল দু-একটা জিনিষ কিনে আনতে। ছেলে বেরল, সঙ্গে তাঁর প্রিয় কুকুর পপিকেও নিয়ে গেল। কিন্তু সেই যে গেল আর বাজার থেকে ফেরে না। প্রভাবতী দেবী একবার বাইরে একবার ঘর করছেন। বাড়ীর লোকেরা ভীষ্মকে খুঁজতে শুরু করল, কিন্তু কোথাও পেল না। সকলের মনের অবস্থা যখন খুব খারাপ, একেবারে হতাশ করা, তখন পপি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ডাকতে শুরু করল। সে একবার বাড়ীর বাইরের দিকে ছুটে যায় তো আবার ভেতরে ছুটে আসে। বাড়ীর লোক বুঝল যে কুকুরটা একটা কিছু বলতে চাইছে। ও নিশ্চয় জানে যে ভীষ্মকে কোথায় পাওয়া যাবে। বাড়ীর লোক পপির পিছু নিল। ওর পিছন পিছন গিয়ে দেখা গেল যে, ও একটা মন্দিরের ভেতর ঢুকে গেল। বাজার করতে বের হয়ে ছেলে মন্দিরে কি করছে? সবাই অবাক হয়ে ভেতরে গেল। ভেতরে গিয়ে সকলে আরও অবাক। ছেলে মন্দিরের শ্বেত পাথরের চাতালে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাশে বাজারের থলি পড়ে আছে। কিছুই কেনেনি। তা না কিনুক, ছেলেকে তো ফিরে পাওয়া গেছে। বাজার করতে ও ভালবাসেনা তা প্রভাবতীদেবীর জানাই ছিল, তবু সংসারে কখনও কখনও প্রয়োজন হয়ে পড়ে বাজারে পাঠাবার। কিন্তু তাঁর পুত্রের মধ্যে ভাল লাগা বা না লাগার তীব্রতা এমন একটি স্তরে আছে তা তিনি সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করলেন। তাই এমন একটি মনোশক্তিসম্পন্ন পুত্রকে কার কাছে সংগীত শিক্ষা করতে পাঠাবেন তা নিয়ে তিনি অবশ্যই ভাবিত ছিলেন।

এই সময়ে ১৯২০ সালে পরপর দুটি সংগীতানুষ্ঠানে ভীষ্মদেবকে সংগীত পরিবেশন করতে হল। প্রথমটি 'সিনেট হল'-এ। যেখানে সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ভীষ্মদেবের সেদিনের গান শুনে অভিভূত স্যার আশুতোষ তাঁর হাতে একটি পুষ্পস্তবক দিয়ে বলেছিলেন—"এই ফুলের সৌরভের মত তোমার যশ যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে"।

দ্বিতীয়টির পরিচালনায় ছিল অধুনালুপ্ত 'ভারত সংগীত সমাজ'। বিধান সরণীর ওপর বর্তমান বিদ্যাসাগর হস্টেল ও আর্যসমাজ মন্দিরের বিপরীত দিকে একটি দোতলাবাড়ীর ওপর তলায় একটি প্রশস্ত হলঘরে ছিল এই 'ভারত সংগীত সমাজ'। এখানে তখন বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠান হত। এক সন্ধ্যায় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি জলসায় বালক ভীষ্মদেব আমন্ত্রিত হ'ল সংগীত পরিবেশনের জন্য। সেই অনুষ্ঠানে আরও শিল্পী ছিলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কুটে গোপাল), প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক দুর্লভ ভট্টাচার্য প্রমুখ গুণীজনেরা। ভীষ্মদেবের গান হল ঠিক রাধিকাবাবুর পরেই। রিনরিনে মিষ্টি একটা গলা অবলীলায় সাতস্বরে খেলা করে চলেছে। রাধিকাপ্রসাদ গান শুনে কাছে এসে জানতে চাইলেন, সে কার কাছে তালিম নিচ্ছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভীষ্মদেবের প্রথাগত তালিম কারও কাছে হয়নি। রাধিকাবাবু তার দীর্ঘজীবন কামনা করে বড় শিল্পী হবার আশীর্বাদ

করলেন।

এবার ভীষ্মদেবের অভিভাবকদের সত্যিকারের ভাবনা শুরু হল সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত সঠিক পদ্ধতিতে না হওয়ার জন্য। বালক নিজ প্রতিভার জোরে সুনাম অর্জন করে ঘরে আসছে, অথচ তাঁর অভিভাবকেরা এখনও পর্যন্ত তাঁর প্রকৃত তালিমের কোন ব্যবস্থাই করে উঠতে পারেননি। খোঁজখবর করে জানা গেল ঐ অঞ্চলে বাস করেন রানাঘাটের নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। তাঁর তখন টপ্পা গায়ক হিসেবে বেশ নাম। তাঁর প্রথম গুরু হলেন রানাঘাটের প্রসিদ্ধ ধ্রুপদীয়া নগেন ভট্টাচার্য মহাশয়। পরে খেয়ালের তালিম খলিফা বদল খাঁ সাহেবের কাছে। এই নগেন দত্ত মহাশয়ের কাছে ভীষ্মদেবের তালিম শুরু হল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শিষ্যের কণ্ঠ, স্মৃতিশক্তি ও মেধা নগেনবাবুকে চমৎকৃত করল এবং একই সঙ্গে চিন্তিতও করল

ঠিক এই সময়ে মাত্র বছর বারো বয়সে এইচ. এম. ভি. রেকর্ড কোম্পানী থেকে ভীষ্মদেবের একটি রেকর্ড প্রকাশিত হল বাংলা টপ্পা গানের। গান দুটি হল 'সখি কি করে', 'এত কি চাতুরী'। এই রেকর্ডের মাধ্যমে ভীষ্মদেবের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। এবং সে রেকর্ড প্রকাশিত হল প্রেস্টিজ লেবেলে। রেকর্ডের বিজ্ঞাপনে লেখা হল।...**"বালক এই অল্প বয়সে সংগীতে কিরূপ নিপুণতা অর্জন করিয়াছেন তাহা এই গান দুইখানি শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমানের কণ্ঠস্বর অতি কমনীয় এবং সংগীতে জ্ঞানও অনন্যসাধারণ। কাজেই গান দুইখানি অতিশয় মনোমুগ্ধকর হইয়াছে।"**

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সঙ্গে সংগীত শিক্ষাও অগ্রসর হতে লাগল সমানভাবে। এইভাবে বছর দুই চলার মধ্যেই নগেনবাবু শিষ্যকে নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়লেন। তাঁর সংগীতের ভাণ্ডার তখন প্রায় নিঃশেষিত হবার পথে। বালকের দ্রুত গ্রহণ ক্ষমতা তাঁকে প্রতিনিয়ত বিস্মিত করে তুলছিল। শেষে তিনি বালকের প্রতিভার কাছে হার স্বীকার করে নিয়ে জোহরা বাঈ, গহরজানদের সদ্য প্রকাশিত রেকর্ড শোনাতে শুরু করলেন। বালক তখন সেই সব গান শোনে আর ঝড়ের বেগে তান করে গান করতে থাকে। এইভাবে যখন তালিম চলছে তখন ভীষ্মদেবের জীবনের সেই পরম মুহূর্তটি কাছে এসে গেল। যে মুহূর্তটির অপেক্ষায় একজন শিষ্য তার প্রকৃত গুরুর জন্য থাকে, একজন গুরু একজন প্রকৃত শিষ্যের জন্য থাকে।

একদিন নগেন দত্তের বাড়ীতে জোহরা বাঈয়ের সদ্য প্রকাশিত একটি রেকর্ডের সঙ্গে সঙ্গে ভীষ্মদেব গেয়ে চলেছে, হঠাৎ সেখানে খলিফা বদল খাঁ সাহেবের আবির্ভাব হল শিষ্য নগেন দত্তকে তালিম দেবার জন্য। তাঁর উপস্থিতি কেউ বোঝেনি দেখে তিনি ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলেন আর বালকের আশ্চর্য কণ্ঠ সম্পদকে লক্ষ্য করলেন। গান শেষ হলে ঘরে প্রবেশ করে নগেনবাবুকে বললেন—"লড়কা হোনহার হ্যায়, কিস্‌কা শাগির্দ হ্যায়?" নগেনবাবু কুণ্ঠিত ভাবে জানালেন যে, তাঁরই শিষ্য। খাঁ সাহেব একথা শুনে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্ট ভাষায় নগেনবাবুকে বললেন—'ইসে তালিম দেনা তুমহারে বস্‌ কা বাত নহী' অর্থাৎ, এই বালককে তালিম দেবার ক্ষমতা তোমার নেই। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন শরৎ দাস নামে এক ব্যক্তি। তিনি নগেন দত্তর সম্পর্কিত ভাই কিন্তু ভীষ্মদেবের অসম্ভব গুণগ্রাহী। তিনি ভীষ্মদেবকে সঙ্গে করে অনেক আসরে গান করাতে নিয়ে গেছেন।

তিনি কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর ভাই আর ছেলেটিকে সামাল দিতে পারছে না। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছেন না। কিন্তু আজ তিনি যে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছেন তা আর হাতছাড়া করতে চাইলেন না। খাঁ সাহেবের কথার পিঠেই বলে উঠলেন, 'আপনি ওকে তালিম দেবেন?' বদল খাঁ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—'হাঁ হাঁ কিউঁ নহী?' গুরু নিজের থেকে ভীষ্মদেবকে চেয়ে নিলেন তাই নগেনবাবুর আর কিছুই বলার রইল না। তিনি সম্মতি দিলেন।।

১৯২৩ সালের বসন্তকালে খলিফা বদল খাঁ সাহেবের কাছে ভীষ্মদেবের তালিম শুরু হল। পরম্পরাগত ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম প্রথাগতভাবে শুরু হল। ভীষ্মদেবের সামনে সংগীতের এক নুতন দ্বার উন্মোচিত হল। গুরু পেলেন এক মনমত শিষ্য। তিনি এতদিন যেন এমনই কারও অপেক্ষায় ছিলেন। মন উজাড় করে তালিম দিতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ীতে সকলের মনে একটা অশান্তি দেখা দিল। ভীষ্ম গান তা শিখছে কিন্তু একদম রিয়াজ করছে না যে। খালি খেলে বেড়াচ্ছে। একদিন বদল খাঁ সাহেবের কাছে নালিশ করা হল যে, তাঁর শিষ্য একদম রিয়াজ করছে না। সব শুনে খাঁ সাহেব শান্ত স্বরে বললেন—'ও বহুত জনম রিয়াজ করকে আয়া হ্যায়। অব সির্ফ ইয়াদ দিলানা বাকী হ্যায়।' তারপর কপালে একটা আঙ্গুল ঠেকিয়ে বললেন, 'উসকে য়হাঁ সবকুছ হ্যায়। মেরা কাম হ্যায়, চাভি সে কোঠিকা দরবাজা খোল দেনা।' বললেন, ও অনেক জন্ম ধরে অভ্যাস করে এসেছে। এখন ওকে শুধু মনে করিয়ে দিতে হবে। ওর কাছে সব কিছুই আছে। আমার কাজ হল শুধু চাবি দিয়ে ঘরের দরজাটা খুলে দেওয়া। এ এক অদ্ভুত এবং অবিস্মরণীয় উক্তি, এক নবতিবর্ষপ্রায় প্রাজ্ঞ গুরুর তাঁর কিশোর শিষ্যের প্রতিভার মূল্যায়নে।

খাঁ সাহেব কিশোর ভীষ্মদেবকে তালিম দিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর তখন যৌবনের কণ্ঠস্বর আর নেই। তাই তিনি শিষ্যকে তালিম দেবার জন্য এক পন্থা অবলম্বন করলেন। কিছুটা গান গেয়ে কিছুটা সারেঙ্গী বাজিয়ে তাকে শোনাতে লাগলেন। কিশোর মন দিয়ে তা শোনে আর কি বোঝে, সে-ই জানে। শুধু দেখা যেতে লাগল ঐ ছোট ছোট অংশের স্বরবিন্যাস থেকে সে অনেক অনেকক্ষণ ধরে গান করছে। তাঁর গান খাঁ সাহেব শুনছেন আর বলছেন, 'হাঁ হাঁ ঠিক হ্যায়, আগে বঢ়ো।' এইভাবে কিশোর ভীষ্মদেব নিজের প্রতিভা, মেধা এবং উদ্ভাবনী শক্তিকে শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্বেই ব্যবহার এবং যাচাই করার বিরাট সুযোগ পেলেন এবং গুরুর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করার বিশেষ কোনও সুবিধা না থাকায় তাঁর নিজস্ব একটা গায়কী তৈরি হয়ে গেল। তার ফলে খাঁ সাহেবের অন্যান্য পুরাতন শিষ্যদের সঙ্গে ভীষ্মদেবের গায়কীর পার্থক্য হয়ে গেল শুরুতেই। খাঁ সাহেবের তখন কাজ হল প্রাচীন বন্দীশ, তাঁর বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা মিশ্রিত নানারকমের ফান্দা এবং রাগের চলন শিষ্যকে শিখিয়ে দেওয়া আর রাগ রাগিনীর অনেক রহস্য এবং খণ্ডমেরু বা তান প্রস্তার পদ্ধতির তালিম দেওয়া। প্রাথমিকভাবে তালিম চলতে লাগল রাগ 'মালকৌশ'এর। একাদিক্রমে ছয়মাস ঐ অবিস্মরণীয় প্রতিভাসম্পন্ন শিষ্যকেও ঐ রাগের তালিম নিতে হয়েছিল।

পরিবারে কখনও কেউ সংগীতচর্চা না করার জন্য তালিম কাকে বলে তা কারো জানা ছিল না। পিতা আশুতোষ দেখেন যে ছয়মাস ধরে একটি গানই চলছে। এদিকে খাঁ সাহেবকে

গুরু দক্ষিণা হিসেবে যে অর্থ দিতে হচ্ছে তা মধ্যবিত্তের কাছে অনেক বেশীই। যে যুগে একজন করণিকের মাসিক আয় ছিল কুড়ি টাকার কাছাকাছি এবং চালের দাম ছিল দু'টাকা মন এবং ঐ কুড়ি টাকায় একজন মধ্যবিত্ত সপরিবারে স্বচ্ছন্দে সংসার নির্বাহ করতেন, সেই যুগে বদল খাঁ সাহেব ভীষ্মদেবকে যেদিনই গান শেখাতে আসতেন তাকে দুটাকা করে গুরুদক্ষিণার সঙ্গে আলাদাভাবে রিক্সাভাড়াও দেওয়া হত। এমন কি কতদিন এমনও হয়েছে যে খাঁ সাহেব সকালে গান শিখিয়ে গেছেন, কিন্তু রাতে আবার কোনও গান মনে পড়েছে আর ভেবেছেন এটা এখনই কাল্লুকে শিখিয়ে আসি। ব্যাস রিক্সায় চড়ে চলে এসেছেন গান শেখাতে। সেদিন তাঁকে একইভাবে সকালের মত গুরুদক্ষিণা এবং রিক্সাভাড়া দেওয়া হয়েছে। একদিন এমনও হয়েছে যে, খাঁ সাহেব তালিম দিয়ে রিক্সায় চড়ে চলে গেছেন, আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ডেকেছেন 'বাচ্চা' 'বাচ্চা' বলে। বলেছেন, 'এক ফকির নে তিন রোজ খানা নহী খায়া থা, ম্যায়নে রূপয়া উসে দে দিয়া, অব হমে রূপয়া দো'। তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। বাড়ীতে পুরুষমানুষ বলতে কেউ নেই যে তার কাছে টাকা চাওয়া যাবে। মাতা প্রভাবতী অসহায় হয়ে সিন্দুক খুঁজেছেন, কিন্তু সেখানে একটাও টাকা না পেয়ে গেছেন পাশের বাড়ীর ডাক্তার গৃহিনীর কাছে। সেখান থেকে দু'টাকা ধার করে এনে তাঁকে দিয়েছেন কিন্তু গুরুকে বিমুখ করেননি। ভীষ্মদেবমাতার এই অনুভূতি এবং দূরদর্শিতা আজও আমাদের বিস্মিত করে। অ্যাকাডেমিক এডুকেশন বলতে যা বোঝায় তা তাঁর কিছুই ছিল না, কিন্তু কোন্ শিক্ষা তাঁর ছিল যে যার দ্বারা তিনি পুত্রের জন্য সঠিক গুরুকে চিনে নিতে পেরেছিলেন, আর অত অসুবিধার মধ্যেও তাঁকে বিমুখ করেননি, এ ব্যাপারটা আমাদের এই প্রগতির যুগেও ভাবায়।

এইভাবে যখন সংগীত শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় হচ্ছে তখন স্বভাবতই ছয়মাস ধরে একটিই গানের শিক্ষা পিতা আশুতোষকে চিন্তিত করেছিল। পুত্র যেদিন খাঁ সাহেবের কাছে তালিম নিত সেদিন বাড়ীতে থাকলে যে ঘরে সংগীত শিক্ষা চলত তার দরজার কাছে বাইরে বসে তিনি গড়গড়ায় ধূমপান করতেন। রোজই এক গান শুনে শুনে একদিন তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেই বসলেন, "বাবা ভীষ্ম, খাঁ সাহেব কি তোমাকে আর কোনও গান দেবেন না, ছয়মাস ধরে একই গান শিখছ?" বদল খাঁ সাহেব বাড়ী থেকে বের হবার মুখে কথাটা শুনতে পেয়ে ফিরে আসেন, এসে বলেন—"মালকৌশ এ্যায়সা রাগ হ্যায় জো ছে মহিনে কিউঁ, ছে জিন্দগীমে পুরা নহী হোতা হ্যায়। ম্যায় অভী জমীন তৈয়ার কর রহা হুঁ। ইসকে বাদ দেখিয়ে গা।" বললেন—মালকৌশ এমন একটা রাগ, যা ছয় মাস কেন ছয় জন্মেও সম্পূর্ণ শেখা যায় না। আমি এখন জমি তৈরি করছি। এরপর দেখবেন যে কি হয়! সত্যিই কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে সকালে কোনও নতুন রাগের তালিম খাঁ সাহেব দিচ্ছেন আর সেই দিন রাতেই ভীষ্মদেব তা আসরে পরিবেশন করে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে আসছেন।

এইখানে বদল খাঁ এবং তাঁর ঘরানা সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া আবশ্যক। যতটা জানা যায় মুহম্মদ শার সময়ে বদল খাঁ সাহেবের এক পূর্বপুরুষের নাম ছিল ছঙ্গে খাঁ। যিনি ধ্রুপদীয়া ছিলেন এবং পরে ন্যামত খাঁ শাহ সদারঙ্গের নিকট খেয়াল গানের তালিম নেন। সিপাহী বিদ্রোহের বেশ কিছু পূর্বে এই বংশে জন্ম নেন মিঞা হৈদর বক্স। সে সময়ে সংগীতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে 'মিঞা' তাঁকেই বলা হত যিনি নতুন কিছুর সৃষ্টি করতেন বা

নতুনের পথ দেখাতেন। হিন্দু হলে বলা হত 'নায়ক'। ইতিহাসে ছাপার অক্ষরে পাওয়া যাচ্ছে এই বংশে হৈদর বক্সই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি গানের সঙ্গে সারেঙ্গী যন্ত্রটিকে উচ্চস্থান দেন। সারেঙ্গীর সবরকমের বাজ তাঁর দখলে ছিল বলে তাঁকে 'চৌমুখী সারেঙ্গীয়া' বলা হত। ইনি যখন সম্রাটের দরবারে যেতেন তখন এক তঞ্জামে তিনি যেতেন আর অন্য এক তঞ্জামে তাঁর সারেঙ্গী যেত। বদল খাঁ সাহেব এই মিঞা হৈদরের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য ছিলেন। লিখিত ভাবে এটাই পাওয়া যায় যে এই বংশে মিঞা হৈদরই প্রথম সংগীতজ্ঞ যিনি কণ্ঠ এবং যন্ত্র দুইয়েতেই পারদর্শী ছিলেন। ইতিহাস খুঁজলে এটাও জানা যায় যে দিল্লী, পাতিয়ালা, কিরানা প্রভৃতি ঘরে সারেঙ্গী বরাবরই কমবেশী ছিল। তাই মিঞা হৈদরের পূর্বে এই বংশে কারও সারেঙ্গীতে দখল থেকে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

পিতৃব্যের মৃত্যুর পর বদল খাঁ খলিফা হন। তাঁর খলিফা হওয়ার ঘটনা বেশ শিক্ষণীয়। হৈদর বক্সের তিনজন শিষ্য ছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র বদল খাঁ, বুনিয়াদ হুসেন বা বুন্দা খাঁ এবং মিরিচ খাঁ। এর মধ্যে মিরিচ খাঁ ছিলেন সারেঙ্গীতে খুব তৈরী। তাই গুরুর মৃত্যুর পর কে খলিফা হবে এই প্রশ্ন উঠলে তিনি স্বভাবসিদ্ধ মেজাজে জানালেন যে তিনিই যখন সকলের চেয়ে ভাল বাজান তখন তিনিই খলিফা হবার যোগ্য লোক। কিন্তু আরও সবাই বললেন—তা কি করে হয়। ওঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বদল খাঁ রয়েছে, সে থাকতে তোমাকে আমরা খলিফা মানব কেমন করে? মিরিচ খাঁ তখন বলল তাহলে আমাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হোক। ঐ প্রতিযোগিতায় যে জিতবে সে-ই খলিফা হবে। বুন্দা খাঁ ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তাই তিনি এসবের মধ্যে গেলেন না। এদিকে যারা বদল খাঁকে খলিফা করতে চাইছে তারা চিন্তায় পড়ল। কারণ মিরিচ খাঁর বেশ তৈরী হাত। তারা তখন বদল খাঁকে পরামর্শ দিল 'চিল্লা' করবার জন্য। চিল্লা করা মানে চল্লিশ দিন ধরে এক নাগাড়ে রিয়াজ করা। মুসলমানদের মধ্যে এই চিল্লা করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বদল খাঁ এক কথায় সম্মত হয়ে সারেঙ্গী নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। চল্লিশ দিনের মধ্যে তিনি নিজেকে এত উন্নত করলেন যে প্রতিযোগিতায় মিরিচ খাঁকে হার স্বীকার করতে হল। বদল খাঁ খলিফা হলেন।

বদল খাঁ সাহেবের পরে এই বংশে তাঁর পুত্র বাচ্চু খাঁ সারেঙ্গীর তালিম পেয়েছেন। তিনি সুকণ্ঠও ছিলেন, তবে বদল খাঁ সাহেবের কলকাতাবাসী কোন শিষ্যই সারেঙ্গীর তালিম পান নি। সকলেই কণ্ঠ সংগীতের তালিম পেয়েছেন।

যৌবনে বদল খাঁ সাহেব, অল্লাদিয়া খাঁ সাহেব ও গনপতরাও ভাইয়া সাহেবের সঙ্গে বসে বহুদিন রিয়াজ করেছেন। ফলে ঐ দুই ঘরানারও বহু চীজ তাঁর দখলে ছিল। তিনি তাঁর তালিম, সংগ্রহ ইত্যাদির সঙ্গে নিজের শিল্পীসত্ত্বা দিয়ে একটা স্টাইল গড়ে নিয়েছিলেন। যা একটা ঘরানার রূপ নিয়েছিল। তাঁকে অনেক রাজদরবার থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তিনি সে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে আকৃষ্ট না হয়ে জীবনের শেষার্দ্ধ এই কলকাতাতেই অতিবাহিত করেন। ১৮৯০ সালে কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে ছিলেন দমদমে শেঠ দুলীচাঁদের বাগানবাড়ীতে। সেখানে তারা বাঈ নামে এক বাঈজীকে তালিম দিতে হত। তিন চার বছর সেখানে থাকার পর তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি আগ্রায় নিজের বাড়ীতে চলে যান। সিপাহী বিদ্রোহের সময় দিল্লীর বাস তুলে দেবার পর থেকে তাঁরা আগ্রাতেই থাকতেন।

দ্বিতীয়বার বদল খাঁ সাহেব কলকাতায় আসেন ১৮৯৫-৯৬ সাল নাগাদ। ততদিনে শেঠ দুলীচাঁদের মৃত্যু হয়েছে। তাই বদল খাঁ সাহেব এসে বসবাস করতে থাকেন মার্কাস স্কোয়ারের কাছে কলাবাগান অঞ্চলে। সেই সময় থেকে কলকাতার সংগীত প্রেমীরা তাঁর বিশাল সংগীত ভাণ্ডারের সন্ধান পায়। তাঁর শিষ্য হন গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, সত্যেন ঘোষাল, নগেন দত্ত, জমিরুদ্দীন খাঁ সাহেব প্রমুখ সংগীতগুণীরা।

এহেন বদল খাঁ সাহেবের কাছে যখন বালক ভীষ্মদেবের তালিমের কথা উঠেছিল, বাড়ীতে তখন দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। পিতা আশুতোষের অনিচ্ছা, কারণ তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁর পুত্র ভীষ্মদেব এগার বছর বয়সে উপনয়ন হবার পর থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করছে। গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেই বিদ্যালয়ে যায়। এমন একটি ধার্মিক মনোভাবাপন্ন সন্তানের শিক্ষার ভার তিনি কি করে একজন খানদানী মুসলমানের হাতে দেন। অন্যদিকে প্রভাবতী দেবীর ইচ্ছা, খাঁ সাহেবের কাছেই শিক্ষা হোক। এমন অবস্থায় প্রভাবতী দেবীর দূরদর্শিতাই কাজে লেগেছিল তিনি তাঁর পুত্রের প্রতিভাকে সম্যক উপলব্ধি করেই বদল খাঁ সাহেবের কাছে তালিম নির্দিষ্ট করেছিলেন। ভীষ্মদেব সঠিক শিক্ষার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

এই সংগীতশিক্ষা চলাকালীন আর একজন সংগীত ব্যক্তিত্ব ভীষ্মদেবকে নানাভাবে সাংগীতিক শিক্ষা দান করেছিলেন, তিনি হলেন প্রসিদ্ধ বীণকার সৌখিন ধনী হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল। তিনি কৌকুভ খাঁর শিষ্য ছিলেন। হরেন শীল মহাশয় কিশোর ভীষ্মদেবের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসতেন এবং কিশোর ভীষ্মদেবকে কাছে বসিয়ে বদল খাঁ সাহেবের সঙ্গে রাগরাগিনী নিয়ে নানারকমের আলোচনা করতেন যাতে শিক্ষার্থীর সংগীত জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। অনেকদিন এমন হয়েছে তিনি ভীষ্মদেবকে সঙ্গে করে জোড়াসাঁকোর কাছে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেছেন এবং বীণায় নানা রকমের রাগরাগিনী বাজিয়ে শুনিয়েছেন, আর এতে অবশ্যই ভীষ্মদেব উপকৃত হয়েছেন।

ভীষ্মদেবকে প্রথম যেদিন খাঁ সাহেব তালিম দেবার জন্য এলেন সেদিন একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। আর সেদিনই তিনি তাঁর শিষ্যটিকে অনেকটা চিনে নিয়েছিলেন। বালক ভীষ্মদেব বাড়ীর রকে পা ঝুলিয়ে বসে নিজের মনে গান করে চলেছে। হঠাৎ সেখানে রিক্সায় চড়ে বদল খাঁ সাহেব উপস্থিত। রিক্সা থেকে নামতে নামতে তিনি তাঁর শিষ্যটিকে দেখতে পেলেন। বালকের কিন্তু খাঁ সাহেবের দিকে কোনও নজর নেই। খাঁ সাহেব কাছে এসে বললেন, "বেটা একঠো গানা শুনাও।" বালক নিজের মনেই গান করে চলেছিল, হঠাৎ খাঁ সাহেবের গলার আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে গান থামিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। দেখে চিনতে পারল যে এঁকেই সে তার গুরু নগেন দত্তর বাড়ীতে সেদিন দেখেছিল বটে। কিন্তু এখন ইনি এখানে কেন? খাঁ সাহেব দেখতে বিশেষ ইম্প্রেসিভ ছিলেন না। রোগা, লম্বা, মুখে দাড়ি, গোঁফ, গাল দুটো তোবড়ানো, হাড় বের করা। কিন্তু দৃষ্টিটা ছিল খুব প্রখর, অন্তর্ভেদী। খাঁ সাহেব বালকের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। আবার বললেন, 'বেটা একঠো গানা শুনাও'। খাঁ সাহেবের আগমনে গান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন এই কথায় আবার মেজাজ ফিরে পেয়ে ওইখানে রকে বসে সেইরকম পা ঝুলিয়ে কেদার রাগ শুরু করল। খাঁ সাহেব

জীবনের শেষ পাদে এসে এমন একটি মুডী, অভিনব মনের শিষ্যের সন্ধান পেয়ে মনে মনে একটু মজা পেলেন বোধহয়। তিনিও কিছু না বলে ঐ রকেই বসে গেলেন নতুন শিষ্যের গান শুনতে। ভীষ্মদেবের এসবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই। সে চোখ বন্ধ করে নিজের মনে কেদার রাগের বিস্তার করে চলেছে। খাঁ সাহেব সেই মধুঝরা বাঁশীর মত কণ্ঠের সাবলীল গতি প্রকৃতি খেয়াল করে যাচ্ছেন। গান শেষ করে বালক খাঁ সাহেবের দিকে তাকাল, তারপর তার হুঁশ হল যে এঁকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়া দরকার।

কিছুদিন পর একদিন খাঁ সাহেব গান শেখাতে এসে দেখেন তাঁর শিষ্য নেই। খোঁজ করে জানলে সে ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে তিনি ছাদে উঠে গেলেন দেখলেন স্বচ্ছ নীল মুক্ত আকাশে তার ঘুড়িটি যেন আপন মনে ভেসে বেড়াচ্ছে আর তাঁর প্রিয় শার্গির্দ সমস্ত মনটি ঐ মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুড়িটিকে দিয়ে দিয়েছে। বালক এতক্ষণ মগ্ন ছিল ঘুড়ি নিয়ে, মেতে ছিল নিজের কল্পনা নিয়ে, এখন এই অতি বাস্তব খাঁ সাহেব এসে পড়ায় সে সচকিত হয়ে পড়ল। খাঁ সাহেবের বোধহয় নিজের ছোটবেলা স্মরণে এসে গেল। তিনি ধীরে হাত বাড়িয়ে শিষ্যের কাছ থেকে লাটাইটা চেয়ে নিলেন। ইশারায় বললেন, ঘুড়ি উড়িয়ে যাও। বালকের এই অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম হতে না হতে খাঁ সাহেব আস্তে আস্তে গান ধরলেন। এক অভিনব পরিস্থিতিতে তালিম শুরু হল। শিষ্য ঘুড়ি উড়িয়ে যাচ্ছে আর লাটাই হাতে গুরু তাকে তালিম দিয়ে যাচ্ছেন। সংগীতের ইতিহাসে এর জোড়া পাওয়া মুশ্‌কিল।

বদল খাঁ সাহেবের গান শেখাতে আসার দিন বা সময় কোনওটারই ঠিক ছিল না। ফলে পরে আরও কয়েকবার এমন পরিস্থিতি এসেছে যখন তিনি লাটাই হাতে শিষ্যকে গান শিখিয়েছেন। আসলে তিনি শিষ্যটিকে চিনে নিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন এ আর পাঁচজনের মত নয়। তাই একে শিক্ষা দিতে হবে একেবারে অন্যভাবে। এত অনুভূতিশীল একটি বালককে তালিম দিতে গেলে তার মত করেই তালিম দিতে হবে। তাই তিনি তার মনটিকে আঘাত করতে চাইতেন না।

বদল খাঁ সাহেব নিজেই খুব মুডী লোক তার ওপর খুব ক্রোধীও। তাঁর মুড আর ক্রোধ সামাল দিতে গিরিজাবাবু, নগেন দত্ত, জমিরুদ্দীন খাঁ সাহেব প্রমুখ শিষ্যেরা ব্যস্ত থাকেন আর এই বালকটির মধ্যে কি যাদু আছে যে তিনি একেবারে কাবু হয়ে গেলেন। এর আচরণ এত সপ্রতিভ যেন প্রকৃতির সঙ্গে এ সবসময় যুক্ত হয়ে আছে। এর দৃষ্টিটা যেন সামনের সবকিছুকে ছাড়িয়ে মাঝে মাঝে দূরে কোথাও চলে যেতে চায়। আর এফ শার্পে যখন ঐ বাঁশীর মত মিষ্টি গলায় গান করে আর বিশেষ করে তার সপ্তকে যখন সাবলীলভাবে সুরের পর সুর লাগাতে থাকে তখন মনে হয় যেন ও সুরের মধ্য দিয়ে আর কিছু পেতে চাইছে। অচিরেই গুরু তাঁর এই শিষ্যটিকে পুত্রসম ভালবেসে ফেললেন। তিনি এমন একটি প্রাণসম্পদে ভরা অসামান্য প্রতিভাধর একটি শিষ্যকে পেয়ে জীবনের শেষ চরণে এসে খুব খুশী হয়ে উঠলেন। মন ভরে তালিম দিতে লাগলেন।

সংগীতসাধনা এবং অধ্যয়ন একই সাথে চলতে লাগল। আর চলতে লাগল বিভিন্ন সংগীতানষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন। যাতায়াতের সময় সংক্ষেপ করতে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল থেকে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমী'তে ভর্তি করানো হল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যোগ্যতার

সঙ্গে ভালভাবে তিনি উত্তীর্ণ হলেন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু তিনি তখন জানতেন না যে সংগীত তাঁকে এত সন্মান, এত সুযোগ এবং সর্বোপরি উপলব্ধির এমন এক স্তরে উন্নীত করবে যে, কলেজের সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট পঠনপদ্ধতি তাঁর কাছে গৌণ হয়ে যাবে।

সে সময়ে কলেজ গুলির মধ্যে সংগীতের প্রতিযোগিতা হত। ভীষ্মদেব প্রথম বছরেই খেয়াল, টপ্পা এবং ঠুম্‌রী তিন বিভাগে আন্তঃ কলেজ সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে সবার নজর কাড়লেন। তিনি এই তিন বিভাগে এত বেশী নম্বর পেলেন যে সে বছর বিদ্যাসাগর কলেজ ঐ নম্বরের জন্য সংগীত প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেল। দ্বিতীয় বছর প্রতিযোগিতা আসন্ন। তখন সকলের মুখে মুখে ফিরছে একটি নাম—ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতার সময় কলেজের ছাত্ররা চাপা উত্তেজনার মধ্যে। সকলেই জানে যে ভীষ্মদেবকে হারিয়ে দেবার ক্ষমতা কারও নেই, কারণ ও যে স্টাইলে গাইছে সেই স্টাইলই কারও নেই। বলতে গেলে ভীষ্মদেবই প্রথম বাঙালি যার গায়কীর মধ্যে বাংলার গায়কীর ছিটে ফোঁটাও নেই। সম্পূর্ণ নিজস্ব ঢঙে পশ্চিমা স্টাইলে গান করে। এই গায়কী বাংলায় একেবারে নতুন। তার ওপর রয়েছে এক শার্পে বাঁধা বাঁশীর মত মিষ্টি গলা। দুর্ধর্ষ তান আর লয়কারী।। সুর-তাল-লয়কে যেন মুঠোয় করে রেখে দেয়। সর্বোপরি আছে তার গৈরিকবসন পরিহিত সৌম্য মূর্তি, যা একবার দর্শনেই মন কেড়ে নেয়। একে হারাবে কে? কিন্তু তবুও দুশ্চিন্তা থেকেই যায়। প্রতিযোগিতা শুরু হল। যখন ভীষ্মদেবের সময় এল এবং তিনি ধীর পায়ে এসে মঞ্চে বসলেন তখন বিদ্যাসাগরের তো বটেই অন্যান্য কলেজেরও অনেক ছাত্রের বুক দুরুদুরু। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি গলা দিলেন সেই মুহূর্তেই সবার জানা হয়ে গেল সেবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীর নাম আর কোন নয়—ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। সেবারেও তিনি খেয়াল, টপ্পা এবং ঠুম্‌রি তিন বিভাগেই প্রথম হলেন।

ক্রমে আই.এ. পরীক্ষা এগিয়ে এল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি সে সময় অত্যন্ত অসুস্থ থাকার জন্য পরীক্ষা দিতে পারলেন না। ইতিমধ্যে তিনি সংগীতের মধ্যে নিজেকে এত ডুবিয়ে দিয়েছিলেন যে কলেজের গতানুগতিক পড়ার মুল্য তাঁর কাছে আর রইল না এবং ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে গেল।

চারিদিকে তখন এই গেরুয়াধারী তরুণের গান শোনার জন্য শ্রোতাদের ব্যাকুলতা বাড়ছে। তার বিদ্যুৎগতির তান, লয়ের প্যাঁচ, সুমিষ্ট কণ্ঠ, অনোখা স্টাইলের গায়কীতে শ্রোতারা বিস্মিত, মুগ্ধ, বিমোহিত। আর যাঁরা তাঁর সঙ্গ করছেন তাঁরা এই প্রাণোচ্ছল তরুণটির প্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি করতে পারছেন। এর প্রচণ্ড আকর্ষণী, উদ্ভাবনী শক্তি, সকলকে দিন প্রতিদিন আরও আকৃষ্ট করে তুলছে। এছাড়া ভীষ্মদেবের জীবনকে দেখবার স্টাইলটা বোধহয় আলাদা, সবই তাঁর অভিনব। যেমন হঠাৎ একদিন তিনি ভাবলেন যে ভিক্ষে করতে বেরলে কেমন হয়? বন্ধুদের মাঝে নিজের ইচ্ছেটা জানালেন। বন্ধুরাও যেন ভীষ্মদেবের এমন একটা উদ্ভাবনের অপেক্ষাতেই ছিল। সকলে এক কথায় রাজি। একদিন সকাল বেলায় হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে ভীষ্মদেব ভিক্ষে করতে বের হলেন। সঙ্গে বেশ কিছু তরুণ গায়ক। ঐ দলে মেহেদী হুসেন খাঁর শিষ্য বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও আছেন, তিনি ভীষ্মদেবের চেয়ে পাঁচ

ছয় বছরের বড়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভীষ্মদেবের অনুগামী। সবাই মিলে গান করতে করতে চলেছে। চারজন তরুণ চলেছে একটা কাপড়ের চারটে কোণ ধরে। কারণ ভিক্ষের পয়সাগুলো নিতে হবে তো। রাস্তায় সকলের এই অভূতপূর্ব দৃশ্যটি দেখে মুখে হাঁ আর বন্ধ হয় না। অনেকেই পয়সা দিতে থাকে। সন্ধ্যা হলে ভীষ্মদেব বিমলাপ্রসাদকে বললেন—দাদা দেখতো কত হল? বিমলাপ্রসাদ গুণে দেখলেন গোটা দশেক টাকা হয়েছে। বললেন—'হ্যাঁরে এই টাকাগুলো দিয়ে কি করবি? এক নির্বিকার উত্তর এল—ভিখারীদের দিয়ে দেব।'

সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই শিশুসুলভ মনকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন কোন্ অজ্ঞাত শক্তিতে, তা জানা নেই। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে সে মন জর্জরিত হয়নি। দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক স্রোতকে তুচ্ছ করে তিনি নিজের সুরে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। শত চেষ্টাতেও তাঁকে তাঁর স্বাভাবিকত্ব থেকে টলানো যায়নি। লোকে হার মেনেছে, তিনি মানেন নি।